চিকিৎসা নয় চাই প্রতিরোধ

পাঁচ জনের সংসারে আকবর আলী একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। চাকরি করেন সরকারি অফিসে। সংসারের প্রয়োজনীয় খরচ জোগাতে তাকে প্রতি মাসে হিমশিম খেতে হয়। বাজার, ছেলে-মেয়েদের পড়ালেখা, বাড়িতে টাকা পাঠানো সবকিছুর খরচ দেবার পর উদ্বৃত্ত কিংবা সঞ্চয় বলে তার হাতে কিছু থাকে না। দেশের অন্য আট-দশটা মধ্য ও নিম্নবিত্ত পরিবারের ব্যতিক্রম নয় আকবর আলীর পরিবার। মাসের খরচের হিসাব কষতে কষতে চলে আসে নতুন একটি মাস।

হঠাৎ করে আকবর আলীর পরিবার মুখোমুখি হয় বিরাট সমস্যায়। আকবর আলী আক্রান্ত হন 'হেপাটাইটিস-বি' ভাইরাসে। ডাক্তার বললো, বিশ্রাম নিতে। কিছুদিন পরই আবার অফিসে যাওয়া শুরু করলো আকবর আলী। দিনে দিনে আবস্থার আরো অবনতি শুরু করলো। শেষ পর্যন্ত আকবর আলীর ঠিকানা হলো হাসপাতালের বিছানায়। একবার এই পরিবারটির কথা ভাবুন। কোথা থেকে আসবে চিকিৎসা খরচ? কীভাবে চলবে সংসার? যদি আকবর আলী হাসপাতালের বেড থেকে ফিরে না আসে ? কি হবে এই পরিবারটির অবস্থা?

হেপাটাইটিস-বি এই ছোট্ট শব্দটি আকবরের পরিবারের জন্য বয়ে আনে অন্ধকার। স্বল্প আয়ের লোকের পক্ষে এই বি ভাইরাসের মত ব্যয়বহুল চিকিৎসা প্রায় অসম্ভব। যে রোগটি খুব সহজে প্রতিরোধ সম্ভব তার জন্য কেন এত সংকট?

আকবর আলীর মতো জন্ডিসে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা অনেকেরই আছে। একটু সচেতন হলেই রোগটি এড়াতে পারতেন। তার পরিবারকে চিন্তার মহাসমুদ্রে পড়তে হতো না। জন্ডিসের মতো আরো কিছু মারাত্মক রোগ আছে যেগুলো সচেতন হলে প্রতিরোধ সম্ভব। এই রোগগুলো হলো ডিপথেরিয়া, হুপিংকফ, ধনুষ্টংকার, মামস্ টাইফয়েড, মেনিনজাইটিস, নিউমোনিয়া ইত্যাদি।

এসব রোগ প্রতিষেধকের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ বা দূর করা সম্ভব। যেসব রোগে আক্রান্ত হয়ে মানুষ বেশি মারা যায়, সাধারণত সেসব রোগের প্রতিষেধক দেয়া হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হলো হেপাটাইটিস বি। এটি এমনই এক বিপজ্জনক ভাইরাস, যা মূলত লিভারকে আক্রমণ করে। পৃথিবীতে অন্যতম সংক্রমক ও ঘাতক ব্যাধি হিসেবে হেপাটাইটিস-বিকে গণ্য করা হয়। এই ভাইরাস রক্তের মাধ্যমে সংক্রমিত হয়। জটিল রূপ হচ্ছে লিভার সিরোসিস। লিভার সিরোসিসের কোনো চিকিৎসা নেই। এক সমীক্ষা থেকে জানা গেছে, দক্ষিণ এশিয়ার ৪ কোটি ৩০ লাখেরও বেশি লোক এই ভাইরাস বহন করছে। এইডসের কারণে এক বছরে যত লোকের মৃত্যু হয় হেপাটাইটিস-বি-র কারণে তার চেয়ে ৫ শতাংশ বেশি লোকের মৃত্যু হয়। এ প্রসঙ্গে জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম সাপ্তাহিক ২০০০কে

বলেন, 'লিভার ক্যানসারের সূত্র হলো সিরোসিস। সিরোসিসের সূত্র হলো হেপাটাইটিস-বি এবং বি-র উৎস জন্ডিস। বেশির ভাগ মানুষই জন্ডিসে ভালো হয়ে যায়। তবে ক্ষতি হয় শতকরা ৫ ভাগের। আর বাংলাদেশের জনসংখ্যা হিসেবে ৫ শতাংশ অনেক বেশি।' হেপাটাইটিস-বি টিকার মাধ্যমে প্রতিরোধ সম্ভব। দেশে এমন বহু লোক আছে যার হেপাটাইটিস-বি

'সচেতন হতে হবে'

জাতীয় অধ্যাপক **ডা. নুরুল ইসলাম**

২০০০ : বর্তমান বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে কোন রোগগুলো ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে?

উত্তর : এক সময়ে টাইফয়েড, কলেরা, ডিপথেরিয়া, হুপিং কফ, টিটেনাস, হাম, পোলিও ইত্যাদি রোগ বাংলাদেশে মারাত্মক আকারে ছিল। পরবর্তীতে কলেরা এবং টাইফয়েড ছাড়া অন্য রোগগুলো প্রতিরোধের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। যার ফলে এই রোগগুলোতে মৃত্যুহার এখন অনেক কম। তবে বর্তমানে যে রোগ দু'টি আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যাচ্ছে তা হচ্ছে হেপাটাইটিস বি এবং এইডস।

২০০০ : হেপাটাইটিস-বি কিভাবে বাংলাদেশে এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে?

উত্তর : হোপাটাইটিস বি মূলত রক্ত এবং সিরিঞ্জের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। রক্ত এবং সিরিঞ্জ কোনোটাই এখানে নিরাপদ নয়। পরীক্ষা না করে রক্ত নেয়ার কারণে এবং অপরিশোধিত সিরিঞ্জ ব্যবহার রোগীর সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়ে দিচ্ছে। রক্ত যেমন মানুষকে বাঁচায় তেমনি মৃত্যুর মুখেও ঠেলে দেয়।

২০০০ : বি ভাইরাস প্রতিরোধযোগ্য টিকা অত্যন্ত দামী। সেই হিসেবে কি বলা যায় দামের কারণে গরিবদের মধ্যে রোগীর সংখ্যা বাড়ছে, ধনীদের মধ্যে কমছে?

উত্তর : ধনী হলেই যে বুদ্ধির দিক দিয়ে ধনী হবে তা নয়। এ ক্ষেত্রে সচেতন হতে হবে। ফলে ধনী কি গরিব উভয় ক্ষেত্রে মৃত্যুহার কমবে।

২০০০ : তাহলে বলছেন রোগ প্রতিরোধের মূল কথা সচেতনতা?

উত্তর : হ্যাঁ সচেতনতা, অজ্ঞতার কারণে অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যু এসেছে। যেমন এইডস্ সম্পর্কে অনেকেই অনেক কিছু জানে না। এইডস্ রোগী জানলে তার পাশেও বসতে চায় না। এই অজ্ঞতা থেকে অসহযোগিতা মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

২০০০ : আপনি কি মনে করছেন সচেতনতা মৃত্যুর হার কমিয়ে আনে?

উত্তর : অবশ্যই। এর একটা সফল উদাহরণ পোলিও। চিকিৎসাশাস্ত্রে বলা হয়, পরপর তিন বছর হাসপাতালে যদি কোনো পোলিও রোগী ভর্তি না হয় তবে মনে করা হয় রোগের মৃত্যুহার শূন্য। এখন হাসপাতালের বিছানায় কোনো পোলিও রোগী নেই। শুধু তাই নয়, শিশুদের অন্যান্য রোগের ক্ষেত্রে প্রতিষেধক নেয়ার জন্য শিশুর জন্মের পর থেকে মা- বাবা রীতিমতো সচেতন। তাহলে অন্যান্য রোগের ক্ষেত্রে কেন হবে না।

আক্রান্ত নয় অথচ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। কারণ, বেঁচে থাকতে হলে মানুষকে নিয়মিত মানুষের সংস্পর্শে আসতে হয়। রক্ত দান করতে গেলেও আক্রান্ত হতে পারেন অনেকে। বাচ্চারা যাতে এ রকম ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার শিকার না হয় সে জন্য হেপাটাইটিস-'বি' আক্রমণ করার আগেই এই ঘাতকের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। আর বাচ্চাদের রক্ষা করার একটাই পথ, তা হলো টিকা দেয়া। শুধু বাচ্চারা নয়, বয়স্ক যারা এখনো আক্রান্ত হয়নি, তাদের সময় আছে টিকার মাধ্যমে হেপাটাইটিস বি-র প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার।

আরেকটি মারাত্মক রোগ হলো জলাতঙ্ক। মনে করা হয় জলাতঙ্ক হওয়ার মূল কারণ কুকুর। কিন্তু কুকুর ছাড়াও বিড়াল, বানর, শিয়াল ইত্যাদির মাধ্যমে জলাতঙ্কের ভাইরাস মানবদেহে প্রবেশ করে। জলাতঙ্ক ১০০ ভাগ মৃত্যু ঝুঁকিপূর্ণ রোগ। এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেলে মৃত্যু ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। সূত্র অনুসারে জলাতঙ্ক রোগের কারণে পৃথিবীতে প্রতি বছর প্রায় ৬০ হাজার লোকের মৃত্যু হয় এবং এর প্রায় ২০০ জনের মৃত্যু ঘটে বাংলাদেশে। ভারতের পরে বাংলাদেশে জলাতঙ্কজনিত রোগীর মৃত্যু সংখ্যা বিশ্বের

সফল ইপিআই কার্যক্রম

শুরু থেকেই আমরা জোর দিয়েছি প্রচার মাধ্যমকে। মানুষকে টিকাদানের জন্য পোস্টার, লিফলেট, রেডিও-টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচার শুরু করি। গ্রাম পর্যায়ে এ কাজে মাঠকর্মীরা নিয়োজিত। তারা মানুষের বাড়িতে টিকাদান সম্পর্কে বোঝায়। এক্ষেত্রে প্রতিটি ইউনিয়নকে তিনটি ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়েছে। একেকটা ওয়ার্ডে আছে আটটি করে সাব ব্লক। ২ জন করে কর্মী এই সাব ব্লকে নিয়োজিত থাকে। কর্মীরা বাসায় গিয়ে যোগাযোগ করে। এখানে আমরা ব্যাপক সফলতা পেয়েছি। বর্তমানে শহরেও এই পদ্ধতিতে কাজ হচ্ছে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে ১০টা জোনে ভাগ করে ৯০টা ওয়ার্ডে বিভক্ত করে কাজ করা হচ্ছে। ইপিআইর এই কার্যক্রমে কিছু এনজিও এবং সিটি কর্পোরেশন সহায়তা করছে। ফলে পোলিও সমূলে নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে। এখন শুধু সনদপত্র পাওয়া বাকি কিন্তু পার্শ্ববর্তী দেশে পোলিও থাকার কারণে আমরা পাচ্ছি না। কারণ সনদপত্র পেতে হলে একটা জোনের সবগুলো দেশকে পোলিওমুক্ত হতে হবে। আমরা এখন অপেক্ষায় আছি দক্ষিণ এশিয়া কবে পোলিওমুক্ত হবে।

শুভ্রা চাকমা *মেডিকেল অফিসার কম্যুনিকেশন ইপিআই*

দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। জলাতঙ্ক রোগের বিরুদ্ধে আধুনিক প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিশ্বের অনেক দেশই আজ এ রোগের অভিশাপ থেকে মুক্ত।

এছাড়া শিশুদের ক্ষেত্রে ৬টি মারাত্মক রোগের কথা উল্লেখ করা যায়, যা আজ আর কারো অজানা নয়। সরকারিভাবে টিকা দিয়ে এই রোগগুলো অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। প্রতিষেধক বা টিকার কারণে

বাংলাদেশ আজ পোলিওমুক্ত। সরকারি তথ্যমতে, যদি পরপর তিন বছর কোনো পোলিও রোগী হাসপাতালে না থাকে, তবে ধরে নেয়া হয় পোলিও রোগ নির্মূল হয়েছে। সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি অথবা ইপিআই তথ্য অনুসারে ১৯৮৫ সালের আগে ১১ হাজারে ৫০০ শিশু পোলিওতে আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু ইপিআই-র কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর এ পর্যন্ত ২০ লাখ শিশুর প্রাণ বাঁচানো সম্ভব হয়েছে।

টিটেনাস অথবা ধনুষ্টংকারে আক্রান্ত হয় শিশু জন্মের ৩ দিন থেকে ২৮ দিনের মধ্যে। এ রোগে আক্রান্ত হয়ে হাজার

রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই সচেতনতা গড়ে তোলার দায়িত্ব সরকারের। বাংলাদেশ আজ যে আশঙ্কাজনক অবস্থার মধ্যে রয়েছে তার অন্যতম কারণ সচেতনতার অভাব

হাজার নবজাতক শিশু মারা যেত এক সময়। ইপিআই-র তথ্যানুসারে ২০০১ সালে প্রতি ১০০০ জনে মারা গেছে মাত্র ২%। এ ছাড়াও অন্য যে ৪টি রোগ আছে, সেগুলো সম্পর্কেও মানুষ অনেক বেশি সচেতন আগের তুলনায়। ফলে এ রোগগুলো বিলুপ্তির পথে। যদিও বা কেউ আক্রান্ত হয় তা সহজেই প্রতিরোধযোগ্য।

এক সময় যক্ষ্মা রোগের কোনো চিকিৎসা ছিল না। আক্রান্ত হলেই দিনে দিনে হাড্ডিসার হয়ে এবং অনেক বেশি যন্ত্রণা ভোগ করে দুঃসহ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তো মানুষ। এক সময় চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এই রোগের প্রতিষেধক বের করতে সমর্থ হন। বর্তমানে যক্ষ্মা আর ১০টি রোগের মতোই সাধারণ একটি রোগ। কিছুদিন চিকিৎসা

‘গত দুই বছরে ভ্যাকসিনেশন শব্দটা ব্যাপক আলোচিত’

এম. আজিজুল হক *ব্যবস্থাপনা পরিচালক*
গ্লাক্সো স্মিথ ক্লাইন চেয়ারম্যান

সাপ্তাহিক ২০০০ : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে টিকাদান কর্মসূচি কতটুকু জরুরি বলে আপনি মনে করেন?

এম. আজিজুল হক : বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে নিজের স্বাস্থ্যের জন্য, পরিবারের জন্য টিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে রোগটি প্রতিরোধ করতে। একটি রোগের কাছে একটি পরিবার কতটা অসহায় হতে পারে সেটি আপনি কিংবা আপনার পরিবার ভুক্তভোগী না হলে বুঝতে পারবেন না। হয়তো দেখা যায় রোগ থেকে সুস্থতা আনতে পরিবারটির বিশাল অঙ্কের টাকা খরচ হয়ে যায়। পরিবারটিকে এই ব্যয় বহন করতে হয় সামনের বছরগুলোতে। এ কারণে আমাদের দেশে টিকা অনেক বেশি জরুরি।

২০০০ : বাংলাদেশে যেসব রোগ আছে তার মধ্যে কোনগুলোর জন্য টিকা দেওয়া জরুরি?

এম. আজিজুল হক : ইপিআই হচ্ছে সরকারের একটি উদ্যোগ। নবজাতক শিশুর জন্য ছয়টি রোগের ওপর ইপিআই টিকাদান কার্যক্রম বেশ সফল। ইপিআই-র আওতায় শিশুরা হাম, পোলিও, ডিপথেরিয়া, ধনুষ্টংকার, হুপিংকফ-এগুলো থেকে এখন প্রায় মুক্ত বলা যায়

এরপর যে রোগ ভয়াবহ হিসেবে চিহ্নিত সেটি হলো হেপাটাইটিস-বি। এটা প্রায় অদৃশ্য একটা রোগ। মানুষ দেখতে পায় না, যতক্ষণ না এটা ভয়াবহ পর্যায়ে চলে যায়। একটি পরিসংখ্যানে বলা হয়, দেশে প্রায় ৭% বি-ভাইরাস রোগী আছে। তবে হেপাটাইটিস-বি টিকা ইপিআই-র আওতায় চলে আসছে। যতোক্ষণ পর্যন্ত না আসছে ততক্ষণ বেসরকারিভাবে এই টিকা দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। ইপিআই-এর আওতায় এলেও সরকারের অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার জন্য শুধু নবজাতকরাই পাবে। যারা এর বাইরে থেকে যাবে তাদের যত দ্রুত সম্ভব এই টিকা নিয়ে নিতে হবে।

এরপর সাধারণ যে রোগগুলো- টাইফয়েড, সাধারণ জন্ডিস বা হেপাটাইটিস-এ, চিকেন পক্স আমাদের সবারই হতে পারে। এসব রোগ একটু সচেতন হলেই প্রতিরোধ করা যায়।

২০০০ : গ্লাক্সো স্মিথ ক্লাইন শুধু কি ব্যবসায়িক চিন্তা করে টিকা বা ভ্যাকসিনেশনের দিকে এসেছে?

এম. আজিজুল হক : আমাদের ভ্যাকসিনেশনের ফোকাস খুব পরিষ্কার। ইপিআই সরকারের কাজ করে। আমরা সরাসরি কখনই তার মধ্যে যাই না। আমরা mmúiK হিসেবে কাজ করি। সরকারের প্রচেষ্টার পাশাপাশি আমরা বেসরকারিভাবে কাজ করছি।

সরকারের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সরকার আগামী দশ বছরেও চিকেন পক্সের টিকা দিতে পারবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। আমাদের ফোকাসই হচ্ছে সরকারে যে ভ্যাকসিনগুলো আছে তার বাইরে যে ভ্যাকসিনগুলো মানুষকে রোগ থেকে প্রতিরোধ করতে পারে সেই ক্ষেত্রটাতে কাজ করা।

যে কোনো উদ্যোগের একটি ব্যবসায়িক দিক থাকতে হবে। তা না হলে এটা নিয়ে কেউ কাজ করতে চাইবে না। এর পাশাপাশি ভ্যাকসিনের ওপরে রিসার্চ করি। আমাদের রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্টের পাইপ লাইন দেখলে বুঝতে পারবেন, আমাদের সম্পূর্ণ ফোকাস হচ্ছে যে সব রোগ সমাজের মানুষের জন্য বাধা, সেগুলো নিয়ে কাজ করা।

আজকে গ্লাক্সো স্মিথ ক্লাইন ক্যান্সারের ভ্যাকসিনেশনের ওপরে কাজ করছে। রোগটা ভাইরাসজনিত আমাদের এখানে ডায়রিয়াটা হয়, তার একটা ভ্যাকসিন আমরা বিশ্বব্যাপী বের করতে যাচ্ছি। এর সবগুলোই বিশেষ করে সমাজের মানুষের কথা চিন্তা করে করছি।

২০০০ : কোন কোন রোগের ওপর আপনারা ভ্যাকসিন দিচ্ছেন?

এম আজিজুল হক : আমাদের হেপাটাইটিস বি-র জন্য আছে এনজেরিক্স বি (Engerix-B) হেপাটাইটিস-এ-র জন্য হ্যাভরিক্স (Havrix), হিবেরিক্স (Hiberix) একেবারেই নবজাতকের জন্য। নবজাতকের নিউমোনিয়া প্রতিরোধ এই ভ্যাকসিন। প্রাইয়োরিন (Prioirin) মিজেলস, সাম্পস এবং রুবেলার জন্য। এরপরও আছে ট্রিটনেরিক্স (Tritanrix) ডিপিটি এবং হেপাটাইটিস-বি-র জন্য এটি। বি ভাইরাসের সঙ্গে ডিপিটি টিকা দিয়ে দেয়া হয় চিকেন পক্স, যক্ষ্মা, টিটেনাস এবং পোলিওর জন্যও ভ্যাকসিন দিচ্ছি।

২০০০ : আমরা দেখেছি, ইপিআই কার্যক্রম ব্যাপকভাবে সফল। এর পাশাপাশি আপনাদের অন্যান্য রোগের টিকা রয়েছে। এক্ষেত্রে আপনাদের সাফল্য বা সাড়া কতটুকু?

এম আজিজুল হক : ইপিআইয়ের মতো না হলেও এখানে আমরা ব্যাপক সাড়া পেয়েছি। এখানে আমরা শুধু শিশুদের নয়, বড়দের জন্যও ভ্যাকসিন কর্মসূচি রেখেছি। আমরা এখনো চেষ্টা করছি এই ব্যাপারটা সব ধরনের মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে। এই ক্ষেত্রে আমরা ব্যাপক সাড়া পেয়েছি। যখন আমাদের প্রচারণা শুরু হয়, তখন আমাদের বিজ্ঞাপন দেয়া হট লাইন নম্বরগুলো বাজতেই থাকে। আমি মনে করি, গত দুই বছরে 'ভ্যাকসিনেশন' শব্দটা ব্যাপক আলোচিত হয়েছে। আমরা সাধারণ মানুষ জানাতে পেরেছি, ভ্যাকসিনেশন শুধু শিশুদের জন্য নয়, বড়দের জন্যও। 'ভ্যাকসিনেশন ফর অল' এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে আমরা এই ম্যাসেজটাই দিতে চেয়েছি।

২০০০ : আপনারা কিভাবে ভ্যাকসিনটি বিক্রি করেন?

উত্তর : আমরা দেখেছি অনেক মানুষই ভ্যাকসিন নিতে চায়। কিন্তু জানে না কোথায় যাবে। প্রধান প্রধান ডায়গনস্টিক সেন্টারগুলো আমাদের ভ্যাকসিনগুলো রাখে। আমরা অনেক ক্ষেত্রে ভ্যাকসিনেশন লেখাওয়ালা নিয়ন সাইন দিয়েছি। যাতে মানুষ দেখলে বুঝতে পারে এখানে এগুলো পাওয়া যায় এবং দেয়া যায়। সেই সঙ্গে অনেকে ফোনে বা ই-মেইলে যোগাযোগ করে। তখন আমরা তাদের এলাকা জেনে নিয়ে জানিয়ে দেই তার এলাকার কাছাকাছি কোথায় ভ্যাকসিন দেয়া হচ্ছে। কিংবা পাশাপাশি কোথায় আমাদের ভ্যাকসিনটা পাওয়া যাবে, দিতে পারবে। অনেক জায়গায় 'মাস ভ্যাকসিনেশন কর্মসূচি' নিয়ে থাকি।

২০০০ : বিদেশ থেকে আনা আপনাদের ভ্যাকসিনের কোয়ালিটিটা আপনারা কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন?

এম আজিজুল হক : এটাই হচ্ছে আমাদের প্রধান বিষয়। এ ব্যাপারে আমরা গর্বিত। সারা পৃথিবীতে আমাদের যে ভ্যাকসিনটা যায় সেটা বেলজিয়ামের সাইটে তৈরি হয়। ওখান থেকে পাঠানোই হয় এমনভাবে, যেন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমাদের হাতে আসে। যে প্যাকগুলো আসে সেগুলোর নাইট্রোজেন সিল করে দেয়া হয়। এবং ওগুলো থার্মোফিলিং করা হয়। প্রতিটি প্যাকের ভেতর একটা ছোট্ট তাপমাত্রা মাপক থাকে। যখনই আমরা প্যাকটা খুলি, ওটা বের করে একটা বোতাম টিপে দেখে নেই তাপমাত্রা কি রকম। ফলে তাপমাত্রা সব সময় ঠিক থাকে। আমরা যেখানে ভ্যাকসিন রাখি তার তাপমাত্রাও একই থাকে। এবং ২৪ ঘন্টা একই রকম তাপমাত্রা থাকে।

২০০০ : এই ভ্যাকসিনগুলো কতটুকু ক্রয়সাধ্য?

এম আজিজুল হক : আমাদের মধ্যে একটা ব্যাপার আছে, হয় বিনা পয়সায় ভোগ করা না হয় একেবারেই না কেনা। এখানে ক্রয় ক্ষমতা কোনো ব্যাপার না। তারপরও বলবো, মধ্যবিত্তের জন্য আমাদের ভ্যাকসিনগুলো ক্রয়সাধ্য। কেননা, ভ্যাকসিনগুলো একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর দিতে হয়। যার ফলে খুব একটা চাপ পড়ে না। যেগুলো ক্রয়ক্ষমতার বাইরে সেগুলো কখনই আমরা নিয়ে আসি না।

নিলেই ভালো হওয়া সম্ভব।

গত বছর বিশ্বে এইডস ভাইরাসে আক্রান্ত হয় ৫০ লাখ। মারা যায় এক-তৃতীয়াংশের কিছু কম। তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশে এইডসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা কম হলেও বিপদমুক্ত নয়। ভারত, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড ও চীনে এইডস রোগীর সংখ্যা আশঙ্কাজনক অবস্থানে । গত কয়েক বছরে সারা বিশ্বে এইডসে আক্রান্ত ৭ কোটির মধ্যে মারা যায় প্রায় ৩ কোটি। বাকি অংশের অবস্থাও সন্তোষজনক নয়। আগে থেকে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে না পারলে অত্যধিক জনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশে এইডস মহামারী আকার ধারণ করতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। এই রোগে বেশির ভাগ মৃত্যু হয়েছে অজ্ঞতা ও অসচেতনতার জন্য।

রোগ প্রতিরোধে সচেতনতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই সচেতনতা গড়ে তোলার দায়িত্ব সরকারের। বাংলাদেশ আজ যে আশঙ্কাজনক অবস্থার মধ্যে রয়েছে তার অন্যতম কারণ সচেতনতার অভাব। সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় যদি আগেভাগে সচেতন হতো এবং জনগণকে সচেতন করতো, তবে এমন উদ্বেগজনক অবস্থার সৃষ্টি হতো না। সচেতনতা আপনাকে রাখতে পারে রোগমুক্ত, সুস্থ-সবল। সচেতন হয়নি বলেই আকবর আলীর সাধারণ জন্ডিস মারাত্মক

হেপাটাইটিস-বি-এ রূপ নেয়। অনেক শিশু জন্মের পর প্রতিষেধক না নেয়ার কারণে মৃত্যু অথবা সারা জীবনের জন্য পঙ্গুত্ব বরণ করে। তারও একমাত্র কারণ সচেতনতার অভাব। একটু সচেতন হলেই যেমন এইডসের মতো রোগকে প্রতিরোধ করা যায়, তেমনি অতি সাধারণ জ্বরও চলে আসবে হাতের মুঠোয়। মানুষ শিক্ষিত হলেই সচেতন হবে, অশিক্ষিত হলে সচেতন হবে না তা নয়। সমাজে অনেক মানুষ শিক্ষিত ও ধনী। কিন্তু তারা সচেতন নয়। যারা স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন তারাই সত্যিকারের সচেতন ব্যক্তি। দেখা যায়, কোনো ব্যক্তির এইডস হয়েছে শুনে তাকে মানুষ এড়িয়ে চলে। তারা জানে না এইডস রোগীর পাশে বসলেই আক্রান্ত হবে না। রোগ হতে হলে রক্তের মধ্যে ভাইরাস সংক্রমিত হতে হবে। এসব রোগ শুধু রক্ত বা সিরিঞ্জের মাধ্যমেই সম্ভব।

শিশুদের ৬টি রোগের টিকাদান কর্মসূচি একটি সফল কর্মসূচি। এখন মায়েরা নিজ উদ্যোগেই সন্তান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সন্তানকে টিকা দিচ্ছেন। পোলিও টিকা খাওয়ানোর সময় একটা উৎসবের আমেজ লক্ষ্য করা যায়। লক্ষ্য করা যায় বস্তিতে অনেক বাবা-মা সন্তানের মুখে ঠিকমতো ভাত দিতে পারছেন না, কিন্তু ঠিকই সন্তানের মুখে টিকা তুলে দিচ্ছেন। শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য এটি একটি ইতিবাচক দিক।

প্রশ্ন হলো, এসব রোগের ক্ষেত্রে সচেতনতা এলে অন্যান্য ক্ষেত্রে আসবে না কেন? বিশেষ করে এইডস, হেপাটাইটিস বি-র মতো ভয়ঙ্কর রোগের ক্ষেত্রে? একজন মানুষ পারে নিজেকে একটি সুস্থ জীবন দিতে। এ জন্য দরকার প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং সচেতনতা। টিকা দেয়ার ফলে রোগ অনেকটা নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। টিকার সুবিধা হলো, টিকা রোগ প্রতিরোধ করে। চিকিৎসকদের মতে, চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধটাই ভালো। সুতরাং আসুন আমরা সবাই সচেতন হই, যাতে এসব রোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে জানি এবং সবার জন্য, প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলি।

পারভীন তানী

খাদ্যাভাসের পরিবর্তন

প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশের মানুষ তেল-ঝোলে রান্না করতে ভালোবাসে। নানী-দাদীরা মনে করতেন, যত বেশি মসলা বা তেল দেয়া যায় খাবার তত স্বাদের হবে। বলা হতো, তেলে ভেসে না উঠলে মাছের দোপেঁয়াজা কোনোমতেই দোপেঁয়াজা হয় না। ইদানীং রান্নার রেসিপিগুলোতেও একই ব্যাপার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু এসব তেল-মসলা আমাদের শরীরের জন্য কতটুকু ক্ষতিকর তা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে। যেমন অতিরিক্ত পরিমাণ তেল চর্বি আমাদের শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়িয়ে হৃদরোগীর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়ে দিচ্ছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ফাস্টফুড কালচার। পানির বদলে খাওয়া হচ্ছে কোল্ড ড্রিংকস। এসব ফাস্টফুডের দোকানগুলোর খাবারে খাদ্যমান একেবারেই কম থাকে। এখন দেখা যাক অসুখ-বিসুখের পেছনে খাদ্যাভাস কতটুকু দায়ী। কম পানি পান এবং বেশি পরিমাণে কোল্ড ড্রিংকস যেমন কিডনির অসুখের আশঙ্কা ঘটায়, তেমিন আশঙ্কা থাকে ডায়বেটিসের। ডায়বেটিসের জন্য যে শুধু কোল্ড ড্রিংক্স দায়ী তা নয়। একই তেলে বারবার রান্না, অতিরিক্ত মসলাযুক্ত খাদ্য, রেড মিট ইত্যাদি ডায়বেটিসের জন্য ক্ষতিকর। চিপস, চানাচুর বা তেলেভাজা খাবার খেতে সবাই খুব পছন্দ করে। এগুলো মুখরোচক হলেও বাড়তি ফ্যাটের সমস্যা করে। বিভিন্ন অসুখ-বিসুখই বলুন বা অকাল বার্ধক্যই বলুন, এসবের মূলে আছে ফ্রি র‍্যাডিক্যালস। শরীরের হাইলি রিঅ্যাকটিভ মলিকিউর বা ফ্রি র‍্যাডিক্যাল কোষের ক্ষতিসাধন করে বলেই মানুষের বয়স হয়। ক্যান্সার, হৃদরোগ, নার্ভের নানা রকম রোগ, রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা কমে যাওয়া প্রভৃতি সমস্যা ফ্রি র‍্যাডিক্যালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখে। আমাদের জীবন যাপন পদ্ধতি, মানসিক চাপ, খাদ্যাভাস, কায়িক শ্রমের অভাব- এসব কারণে শরীরে ফ্রি র‍্যাডিক্যালস তৈরি হয়।

একটা জিনিস মনে রাখা প্রয়োজন, বংশগত অনেক রোগ যেমন বাবা-মা কারও হার্টের অসুখ, ডায়বেটিস থাকলে ছেলে মেয়েদেরও তা হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এই আশঙ্কা পূর্ণতা পায় আপনি কি খাচ্ছেন, না খাচ্ছেন তার ওপর। বংশগত রোগের এক-তৃতীয়াংশই খাদ্যাভাসের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলে।

ফলমূল-শাকসব্জি ধোয়া, কাটা আর রান্নার পদ্ধতির জন্য পুষ্টিগুণ অনেক নষ্ট হয়ে যায়। যতটুকু সম্ভব পুষ্টিগুণ ধরে রাখতে হবে। এছাড়াও বাজারের খোলা খাবার, অপরিষ্কার পানি পান এগুলো এড়িয়ে চলতে হবে। কেননা, এগুলো জন্ডিস এবং হেপাটাইটিস-বি রোগের কারণ। আর এটা সবারই জানা, ইদানীং এই রোগ দুটো কি মারাত্মক রূপ ধারণ করছে। শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে পেটে অসুখের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। এসব রোগ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রভাব ফেলে। খাওয়া-দাওয়া একটু নিয়ন্ত্রণ করে চললে আপনি যেমন রোগহীন দীর্ঘজীবন অতিবাহিত করতে পারবেন, তেমনি সাশ্রয় হবে আপনার অর্থের।